Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.72-78
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সুবিমল মিশ্রর তিনটি গল্প নিয়ে

শ্রীনাথ মাইতি
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Subimal Mishra may not be very popular as a storyteller but he isn't quite obscure too. His anti-stories make us think, help us to broaden and refine the space of thought, to re-examine disposition. Breaking from the concept of traditional stories, he creates a unique style by himself. In this case, we are looking at three stories of Subimal Mishra.– 'Haran Majhir Bidhaba Bou'er Mora ba Shonar Gandhimurti', 'Baganer Ghoranimer Gaache Dekhonchacha thakten','Parijatak'. Faced with adverse reality, the characters in the story try to render an amazing grounding to their experiences. Repetition of certain sentences in the stories is intended to harp on the specific thoughts of the storyteller and make them clearer. Variation is levelled up to finer dimensions. This article strives to understand Mishra's penchant by analyzing these three selected stories closely and a few accompanying snippets from the same.

Keywords: Subimal Mishra, Vandalism, Reality, Horror, Adherence.

মূল আলোচনা: সুবিমল মিশ্র সমসাময়িক সমাজজীবনের সমগ্র রূপটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যার পরতে পরতে রয়েছে শাব্দিক ব্যঞ্জনা। ধারালো ভাষায় শব্দ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। গতানুগতিকতা ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন। বর্তমান সমাজের ভাঙাচোরা রূপটিকে অবিকৃতভাবে সকলের সামনে দেখিয়েছেন। মানুষকে টেনে নিয়ে গেছেন ভয়াবহ এক বাস্তবতার মুখোমুখি। সেখানে নিজেদের চেহারার ভয়ংকর রূপটিকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে মানুষ। মুহূর্তের জন্য হলেও থেমে গেছে চিন্তাভাবনার স্রোত। ভাবিয়ে তুলেছে মানুষকে। তাঁর লেখা নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> আমি তেমন কোনো লেখা লিখতে চাই না যা পড়ে লোকে আমার পিঠ চাপড়ে বলবে, বাহা বেড়ে করেছো তো হে ছোকরা, আমি চাই লোকে আমার লেখা পড়ে আমার মুখে থুতু দিক, আঙুল দেখিয়ে বলুক,— এই সেই লোক যে উপদংশ-সর্বস্ব এই সভ্যতার ঘাগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দিনের আলোর মত খোলাখুলি করে দিয়েছে। লোকে দেখুক নিজের অবস্থা নিজেরাই—দেখে শিউরে উঠুক, চিন্তা করুক তার সেই ভেক সামাজিক অবস্থানের কথা—সেখানে থেকে শুরু হবে ওলটপালট যা আসবে মানুষের চিন্তার ক্ষমতা দখল থেকে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল থেকে নয়। আমি চাই মানুষকে উপলব্ধির সেই স্তরে পৌঁছে দিতে যখন সে নিজেই নিজের অবস্থানকে ভাঙতে সুরু করবে।... আমি কলম দিয়ে মানুষকে বিদ্ধ করতে চাই, বিদ্ধ করার ভংগি আমাকে খুঁজে নিতে হয়

> নিজের মতন করে, ব্যাপারটা সাহিত্যটাহিত্য গোছের কিছু হয়ে উঠেছে কিনা এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।[১]

তাঁর এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, ভাঙনের মধ্য দিয়ে মানুষ যাতে নিজেকে কাটাছেঁড়া করতে করতে চিন্তার স্তরকে আলোড়িত করতে পারে সে বিষয়ে তিনি সচেতন। চিরাচরিত গল্প ও তার আঙ্গিক থেকে বেরিয়ে এসে তিনি এমন এক ধরণের গল্প পাঠককে উপহার দেন যা গল্পত্বের যথাযথ মূল্য বজায় রেখে গল্প বলার ঢঙ নিয়ে ভাঙচুর করে। এমন সব বিষয় গল্পে নিয়ে আসেন যাতে করে পাঠক তার রুচিকে নতুনভাবে যাচাই করার সুযোগ পাই। অতিব্যক্তিগত বিষয়কেও তিনি তাঁর লেখার গুণে চরম বাস্তবতার মুখোমুখি এনে দাঁড় করান। প্রথাবিরোধী এই গল্পকার তাঁর গল্পে চরিত্রের ক্ষতবিক্ষত অবস্থাকে শাণিত ভাষা ও তার উপযুক্ত পরিবেশে বিশিষ্ট উপস্থাপন রীতির মধ্য দিয়ে বিন্যস্ত করেন। 'হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি' বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১ এর জুন মাসে। বইটির প্রচ্ছদ ছিল – কলকাতার ম্যাপ, পার্ক স্ট্রিটের গান্ধীমূর্তিটি মার্ক করে দেওয়া। এই গল্পগ্রন্থের তিনটি গল্প— 'হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি', 'বাগানের ঘোড়ানিমের গাছে দেখনচাচা থাকতেন' ও 'পরীজাতক'-কে কেন্দ্র করে আমাদের আলোচনা বিস্তার লাভ করবে।

'হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি' গল্পে হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া- কে লক্ষ্যবিন্দু করে অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমেই হারাণ মাঝির বিধবা বৌ-এর গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বলেছেন কোনো উপায় না পেয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। এর সঙ্গে জানিয়েছেন আর এক বাস্তব সত্য 'বাইশবছরী আঁটো মড়া'। এর মধ্য দিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দিকে আঙুল তুলেছেন। আত্মঘাতী হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের শবদেহটির সৎকারের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি বরং শবদেহটিকে ভাসিয়ে দিয়েছেন প্রবহমান কালের স্রোতে। – 'হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের শব কত দূরে কে জানে, কালিঘাটের দিকে ভেসে আসছে।'[২] কালীঘাট সতীর একান্নপীঠের অন্যতম পীঠ। পাপকর্ম থেকে মুক্তি পেতে মানুষ কালীঘাটের জলে স্নান করতে আসে। এই কালীঘাটের দিকে হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের শবদেহ ভেসে আসছে। ভদ্রলোকের পাপকর্মের প্রামাণ্য নিদর্শন এই শবদেহটি বিচারের জন্য দ্বারস্থ হয়েছে। পুরাণে রয়েছে যে স্বয়ং আদ্যাদেবী ত্রিদেব (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর)-কে পরীক্ষা করার জন্য পচা গলিত শবদেহ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পচা, গলিত শবদেহটির দুর্গন্ধকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেছিলেন। শিব এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। একইরকমভাবে হারাণ মাঝির বিধবা মড়াটিও ভেসে চলেছে সমাজের ভালোমানুষির পরীক্ষা নিতে, লুক্কায়িত অন্ধকারকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে। নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গগত বৈষম্যের বিচার চাইতে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিপরীতে নারীশক্তির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন শবদেহটিকে।

কালীঘাট থেকে হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া যায় রাইটার্স বিল্ডিঙের দরজার গোড়ায়। সেখানে সে পুতনা রাক্ষসীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে জাঠাগাছ হাতে। ক্ষুধিত মানুষের মিছিল এসে ভিড় করে। হারাণ মাঝি বামুন পাড়ার জমিদারদের জমিতে বর্গাদার ছিল। জমিতে লাঙল চষা নিয়ে জমিদারের সঙ্গে বচসা থেকে খুনোখুনি এবং তা থেকে হারাণ মাঝির মৃত্যু। হারাণ মাঝির বৌ পেটের জ্বালায় মুড়ি বেচত। আঁটসাঁট শরীরটাকে সমাজের চোখ রাঙানি থেকে রক্ষা করে। সীতার পাতাল প্রবেশের অনুষঙ্গ গল্পটিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। লজ্জা, দুঃখ, অপমানের হাত থেকে বাঁচতে সীতা নিজেকে আত্মগোপন করতে

চেয়েছিলেন ধরণীর বুকে। সীতার সঙ্গে হারাণ মাঝির বৌয়ের কোথাও একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য দেখাতে চেয়েছেন লেখক। হারাণ মাঝির বিধবা বৌকে নিয়ে উঠে আসে একটি মন্তব্য যা সমাজের ঘাগুলিকে খুঁচিয়ে তোলে— 'বিধবা মেয়েমানুষের উপোষী পেট হচ্ছে বাচ্চা পাড়ার সবচেয়ে প্রশস্ত জায়গা।... মিনসেগুলোর যখন তর সয়না কাপড় খুল্যা লিয়া তলপেটে গুঁতা মারে তখন খ্যাল থাকে না সারাদিন প্যাটে কিছু পড়েনি, তলপেটটা খোঁদল হয়্যা আছে। এর থাইক্যা কুকুর হয়্যা জন্মালিও ভালো ছেল— মেয়্যা মাইনসের জন্মরে ঘেন্না ধরি যায়...'[৩]। হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া ধীরে ধীরে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। —

> চারদিক হৈ হৈ কাণ্ড! বামুনপাড়ার জমিদারবুড়ো সন্ধেবেলা পুকুরঘাটে হাত পা ধুয়ে খড়ম পায়ে বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় তার পায়ের কাছে নরম মতো কি ঠেকে। লম্ফ নিয়ে এসে দ্যাখে হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া। রাম রাম! এর কাছে ওর কাছে শুয়ে মাগিটা পেট করেছিল শেষ কালে কিনা বামুনের বাড়ির বারান্দায়। শহরের মেয়র বাথরুমে যাওয়ার জন্যে উঠেছেন, রাত তখন দুটো, ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছে বিশ্রি একটা পচা গন্ধ পেলেন, আলো জ্বালিয়ে দেখেন হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া সেখানে পড়ে আছে। একজন বিখ্যাত জননেতা সারাদিন যিনি নানা ধরনের সমাজসেবায় ব্যস্ত থাকেন দুপুরের খাবার টেবিলে বসতে গিয়েই দুর্গন্ধ : টেবিলের ওপর হারাণ মাঝির বৌয়ের মড়া পড়ে আছে। ভোর রাতে ট্রাম চালাতে চালাতে ট্রাম-কনডাকটার হঠাৎ নাকে রুমাল চেপে ধরে বিস্ফারিত চোখে দ্যাখে চলার পথ বন্ধ, রাস্তার ওপর হারাণ মাঝির বৌয়ের মড়া শুয়ে রয়েছে। সারা শহরময় খবর ছড়িয়ে পড়ল। সবাই ভীত, মরা মাছের চোখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে , গণ্যমান্যদের ঘরের চৌকির নিচে, আলমারির পেছনে, খাবার ঘরের মেঝেতে, কলতলার অন্ধকারে হারাণ মাঝির বৌয়ের মড়া পাওয়া যাচ্ছে।[৪]

সোনার গান্ধী মূর্তির জায়গায় হারাণ মাঝির বৌয়ের গলিত মড়া দেখে সকলের টনক নড়ে। সবাই বুঝতে পারে যে, এই মড়া না সরালে সোনার গান্ধীমূর্তির নাগাল তারা কোনদিন পাবে না। এর মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয় হারাণ মাঝির বিধবা বউয়ের মড়া সামাজিক মানুষের কুকীর্তির সম্মিলিত প্রয়াসের ফল। তাই এর প্রভাব গোটা সমাজের উপর আছড়ে পড়েছে। 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে' এই পৌরাণিক অনুষঙ্গ এই গল্পে নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে। এই স্বর শুনে সবাই বিচলিত হয়েছে এই ভেবে যে কার প্রতি এই বাক্যবাণ নিক্ষেপিত হয়েছে অথচ কারো বোধগম্য হয়নি। সুবিমল মিশ্র সমাজের উপর তীব্র একটা ঝাঁকানি দিতে চেয়েছেন যথাযথ প্রকরণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য —

> সুসজ্জিত রঙীন অফসেটে ছাপা মলাটের ভিতর থেকে এ গল্প বেরিয়ে আসে না। এ গল্প সৃষ্টি করতে পারেন না খোঁয়াড়ের বেতনপ্রাপ্ত লেখক। এ গল্প লেখা হয় এক ভয়ংকর আবেগ থেকে, নিজের অবস্থানকে ঘৃণা করে, সত্যকে মেনে নিয়ে এবং হৃদয় দিয়ে, যদি সেই হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিক্রীত হয়ে গিয়ে না থাকে ।
>
> সুবিমল মিশ্র এক যোদ্ধার নাম, সুবিমল মিশ্র এক প্রতিবাদের নাম। সুবিমল মিশ্র আমাদের ক্রীতদাস অবস্থান, ভণ্ড শিক্ষা, রাজনীতি ও উদারতার সামনে এক সুতীব্র বিস্ফোরণ।[৫]

আমাদের সমাজের ভালোমানুষির ধারণার মূলে আঘাত করতে চেয়েছেন সুবিমল মিশ্র। যাতে করে মানুষ সচেষ্ট হয় মানবিকতাবোধসম্পন্ন সমাজ গড়ে তুলতে, সচেষ্ট হয় তাদের ভাবনার বদল ঘটাতে।

সত্যকে মেনে নিয়েই সুবিমল মিশ্র সৃষ্টি করে তার সৃষ্টিসৌধ। 'বাগানের ঘোড়ানিমের গাছে দেখনচাচা থাকতেন' গল্পের দেখনচাচা সেরকমই সুবিমল মিশ্রের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। দেখনচাচার বাসস্থান বাগানের ঘোড়ানিমের গাছে। 'বুকে ভর দিয়ে হাঁটতে থাকলে তাঁকে অতিকায় এক আদিম সরীসৃপের মতো মনে হত।'[৬] আদিমতার প্রতিভূরূপে এই দেখনচাচা মন্ত্রের বলে দিব্য-দৃষ্টি দেখাতে পারতেন। একজনকে দেখিয়েছিল।—

> তারপর একজনের গর্দান ধরে 'ওঁ ক্লিং ক্লিং বৌটায় ফট্ সাহা' মন্ত্র পড়লে তার চোখে দিব্য-দৃষ্টি হয়ে যেত, সে দেখত নায়েবমশাই পা টিপে টিপে তাঁর বিধবা শালীর ঘরে ঢুকছে, হাজার একর জমির মালিক চৌধুরীমশাইয়ের গোলায় বেওয়ারিশ ইঁদুরেরা ধান খেয়ে যাচ্ছে চুপিচুপি, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় জলপানি -পাওয়া ছেলে আসন্ন পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে ভোর রাতে ঘুম থেকে উঠে রামপ্রসাদী গাইছে, আমায় দে মা তবিলদারী... তারপর গর্দান ছেড়ে দিয়ে বলতেন : দে শালা দে, দুটো পয়সা দিয়ে যা... অনেক দেখেছিস...'[৭]

এইরকম ছিলেন দেখনচাচা। ভালোমানুষির আড়ালে মানুষের আসল রূপটিকে সকলের সামনে টেনে আনতেন। তা কদর্য হতে পারে কিন্তু তাকে তো অস্বীকার করা যায় না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গল্পের লক্ষ্যবিন্দু। দেখনচাচা নিজেই গল্পের বিষয় ও প্রকরণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। বাস্তবতা এখানে নিরাবরণভাবে শিল্পিত হয়েছে। গাছের ডালে উলঙ্গ দেখনচাচাকে দেখে গ্রামের বৌ, ঝি-রা বিরূপ মন্তব্য করলে দেখনচাচা বলতেন – 'মুখে যায় বলুক মনে তারা আনন্দ পাচ্ছে।' সত্য কথা বলতে দেখনচাচা কখনো পিছু হটত না। এটি দেখনচাচার অন্যতম মানবিক গুণ বলা চলে। 'জ্যোৎস্না রাতে আকাশের চাঁদ কেমন বিধবা যুবতীর মতো এলোমেলো হয়ে যায় দেখতে যাই।'—জ্যোৎস্না রাতের চাঁদ-কে এভাবে তুলনা করে মধ্যবিত্তের চিন্তাধারাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এরপরই গল্পে চিত্রিত হয়েছে অদ্ভুতভাবে কাটানো দেখনচাচার জীবনের শেষ কয়েকটা দিন। কলেরার কারণে সমাজ পরিত্যক্ত গৌর মণ্ডলের যুবতী বৌ মনোরমাকে সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলেছিল দেখনচাচা। এই সেবার প্রতিদান হিসেবে ঐ যুবতীর কাছে চেয়েছিল 'রতি যাঞ্চা'। এইরকম চরিত্রহীন আচরণের জন্য চরিত্রবান লোকেরা দেখনচাচাকে মেরে ফেলেছিল। দেখনচাচার ঠোঁটে লেগে থাকা রক্তাক্ত হাসিটা শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে যায়নি। দেখনচাচার এই পরিণতি আমাদের উপলব্ধিকে বিশেষ এক স্তরে নিয়ে যায়। দেখনচাচা আসলে আমাদের সত্তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রবৃত্তির বিভীষিকাময় রূপ। সত্য তাঁর মধ্যে অবিকৃত ছিল। তথাকথিত চরিত্রবানেরা তাঁকে চরিত্রহীন বলে দোষারোপ করা আসলে নিজেরই বিরুদ্ধে যাওয়া। দেখনচাচার ঠোঁটে লেগে থাকা রক্তাক্ত হাসিটা ব্যঙ্গের সুরে সমাজকে বুঝিয়ে দেয় এভাবে প্রতিকার করা যায় না। তাই যে সকল স্থানে দেখনচাচার রক্ত পড়েছিল সেই সকল স্থানে ঘোড়ানিমের গাছ জন্মে গেছে। সকালের সতেজ আলোবাতাসে নিমগাছগুলির কচি পাতার কাঁপনের মধ্য দিয়ে দেখনচাচা বেঁচে থাকবে তাঁর অম্লান হাসিটি নিয়ে। 'হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি' গল্পের মতো এই গল্পেও দেখি, শ্লেষমিশ্রিত ভাষার দাপট, তথাকথিত সমাজের ভদ্র সভ্য মানুষের ভালোমানুষির উপরে ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ।

সুবিমল মিশ্রের 'পরীজাতক' গল্পে দেখি, সুখময় ও তাঁর তিন বন্ধু রজত, তমাল ও দীপেন রাণীকে নিয়ে সমুদ্রতীরে এসেছলো কিছুদিনের জন্য সুখভোগ করতে। হঠাৎ রাণী মারা যাওয়ায় তাদের সুখভোগ ব্যাহত হয়। রাণীর শরীরকে নিয়ে কাঙ্ক্ষিত ভোগবিলাস তাদেরকে মাতিয়ে রেখেছিল। এমন সময় মাঝরাতে রাণীর মৃত্যু তাদেরকে ভাবিয়ে তুলে। সকলের মধ্যে ভীতিজনিত এক উদ্বেগ খেলা করে। রাত্রিকালীন এই পরিবেশে মোমবাতির নরম আলোর কাঁপন ভয়ের এক আবহ তৈরি করে- 'টিম টিম করে মোমের আলো কাঁপছিল ঘরটায়।' ঘরের মধ্যে সাদা চাদরে ঢাকা রাণীর মৃতদেহ এবং মোমের আলো কাঁপছে- এই পরিবেশের পুনরুক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নিঃশব্দের আবহ নির্মাণ করে। এই নিঃশব্দ লক্ষ করে সুখময় সকলের মধ্যে চঞ্চলতার সঞ্চার ঘটায়। এই চাঞ্চল্য নিস্তেজ হয়ে পড়লে সুখময় সকলকে উজ্জীবিত করে রাণীর নেমকহারামির কথা বলে। নিজেদের ভদ্র সভ্য মানুষ হিসেবে পরিচয় দিয়ে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে রাণীর বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিতে চাই। শাস্তি হিসেবে রাণীর শরীর থেকে তাদের পছন্দের অংশ কেটে নেয়।— "আমরা আমাদের পূর্বোক্ত দাবীর সূত্রে রাণীর শরীর থেকে সেইসব স্থান কেটে নিতে পারি। এতে কোন পাপ নেই। কোন অন্যায় নেই। আমাদের অধিকারই আমরা ব্যবহার করছি মাত্র।"[৮] এরপরেই তারা রাণীর জীবন্ত শরীরের কল্পনা করতে করতে সেই সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ নিয়ে মেতে উঠেছিল বীভৎস এক খেলায়। ক্রমে উত্তেজিত মুহূর্ত থেকে বাস্তবতায় উত্তরণ। ভোর হওয়ার আগে রাণীর শবদেহের কিছু একটা ব্যবস্থা করার চিন্তায় সুখময়ের দৃষ্টি পড়ে রাণীর চোখদুটির উপর। চোখদুটির কটমটে চাউনি বীভৎস ভাব সুখময়ের বুক কাঁপিয়ে দেয়। ভৌতিক আবহ তৈরি হয়— 'মোমবাতির আলোয় ঘরটা ভৌতিক হয়ে উঠেছে।' সুখময় বিপন্নতার হাত থেকে বাঁচতে বন্ধুদের জাগাল। সুখের নীলাভ মাদকতার রেশ কাটিয়ে তাদের বিপদের মধ্যে এনে ফেলল। রাণীর মৃতদেহকে তারা কবর দিতে সমুদ্রের বেলাভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল। লেখকের ভাষায় পরিবেশটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।— 'বালি উড়ে উঠেছে বেলাভূমিতে, ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগছে তাদের চোখেমুখে। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না সমুদ্র আর অন্ধকার পৃথিবী একাকার হয়ে যাচ্ছিল তাদের চোখে।'[৯] তারপর বালিতে শবদেহ নিয়ে এসে নামানোর পর সুখময়ের দৃষ্টি পড়ল রাণীর ভয়ংকর চোখদুটির দিকে, পরক্ষণেই অনুভব করল রাণী হাসছে, তারপর দেখল রাণীর মুখ কান্নায় ভেঙে পড়েছে। রাণীর চোখেমুখে হাসি, ভয়ংকর বিভীষিকা আর কান্না দেখে সুখময় অনুভবশক্তি হীন হয়ে পড়েছিল। রাণীর শবদেহ সুখময়ের চেতনাকে গ্রাস করেছিল। এই গল্প সম্বন্ধে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় একটি নিবন্ধে বলেছেন,

> পরীজাতক গল্পটি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল সেই শ্রদ্ধেয় বিশ্লেষণ যার লক্ষ্য কাফকা, হতভাগ্য ঈশ্বর আমার:To combine in one frame work a conscientiously emperical account of the visible real with a magical decomposition of it. In this pathos lies the pathos of his approach to human existence, গভীর দুর্গপ্রাকার আর নির্জন বেলাভূমি বিষণ্ন বিলাপে ছেয়ে আছে। হয়তো সে নারী নয় শ্রোণী জঙ্ঘা মাংস শুধু মাছির আহার। সে তার পাপ কেন গুপ্ত ঘাতক? আত্মহননের মতো তৃষ্ণা কেন প্রতি রক্তে কাঁদে ?[১০]

এই গল্পে মোমবাতি এবং আলো বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। আমরা বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য গল্প থেকে কয়েকটি পংক্তি একত্রিত করলাম।—

১. টিম টিম করে মোমের আলো কাঁপছিল ঘরটায়।
২. মোমবাতির নরম আলোয় প্রতিটি মুখেই ভয়ের ছায়া দুলছে।

৩. নরম আলোয় তাদের চারজনের ছায়া কাঁপছে দেয়ালে।
৪. মোমের আলো কাঁপছে সারা ঘরটায়।
৫. মোমবাতির আলোয় তাদের হাতে ছুরির ফলা ঝলসে উঠেছিল।
৬. মোমের আলো জ্বলছিল তখন সারা ঘরে।
৭. ঘরের সেই কোণে অন্ধকার। সেখানে মোমবাতির আলো পৌঁছায় না।
৮. ঘরের ভেতর মোম জ্বলছিল, কিন্তু সেই আলো কোথাও কারো চোখে পৌঁচোচ্ছিল না।
৯. টিম টিম করে মোমবাতি জ্বলছে আর মোমের আলোয় সেই-সব ছায়া বড় বেশি আবর্তিত হচ্ছিল একান্ত নিজস্বভাবে।
১০. মোমবাতির আলোয় ঘরটা ভৌতিক হয়ে উঠেছে।

মোমবাতির আলোর এই চিত্রকল্পের পুনরাবৃত্তি গল্পটিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। প্রথমদিকে মোমবাতির আলোর এই কাঁপন বীভৎস পরিবেশ নির্মাণে সহায়ক হয়ে উঠেছে। তাদের ভিতরের মধ্যে থাকা ভয়ের আলোড়ন বাইরের পরিবেশে রূপ লাভ করেছে। মোমবাতির আলোয় তাদের ছুরির ফলা ঝলসে উঠার মধ্যে দিয়ে তাদের ভোগলালসার মত্ত দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ঘরের মধ্যে যেখানে রাণীর শবদেহ শায়িত ছিল, যেখান থেকে তারা রাণীর শরীরের অংশ দুই স্তন কাটছিল সেখানে মোমবাতির আলো পৌঁছায়নি, অন্ধকার এসে গ্রাস করেছিল তাদের চেতনাকে। এ অন্ধকার আদিমতার। আবার রাণীর শরীরের মধ্য থেকে কেটে নেওয়া যে যার নিজস্ব মাংসপিণ্ড নিয়ে তারা যখন ব্যস্ত সেই সময় মোমের আলো কারো চোখে পৌঁছায়নি। নিজস্ব যৌনক্ষুধা মেটানোর কাজে তারা যখন ব্যস্ত তখন মোমের আলো একান্ত নিজস্বভাবে আবর্তিত হচ্ছিল। মোমবাতির আলো যেন তাদের এইসব ক্রিয়াকর্মের সাক্ষ্য দিচ্ছিল। সবশেষে ভৌতিক আবহ নির্মাণে সহায়তা করেছে। মোমবাতির এই আলো নানান অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহুমাত্রিক আবেদন জানিয়েছে।

ভদ্রলোক সম্পর্কে তাঁর ধারণা ঠিক কেমন ছিল সে সম্বন্ধে সুবিমল মিশ্র একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

> ভদ্রলোক বলতে আমি 'মধ্যবিত্ত-মূল্যবোধ' বোঝাতে চেয়েছি। এই ফাঁপা মূল্যবোধে আমার বিশ্বাস ছিল না, আজও নেই। সাধারণভাবে লোকের সঙ্গে ইচ্ছে করেই অভদ্র ব্যবহার করি, ছোট লোকমি করি, আঘাত দিয়ে কথা বলি । আমার ঘরখানা তো এইসব মূল্যবোধের প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি— আপনার কি দেখে মনে হয়নি? কিন্তু আবার এসব ব্যবহার কারো ক্ষতি করবে মনে হলে আমি নিপাট ভদ্রলোক সেজে যাই। যখন মাস্টারি করি তখন তো ভদ্রলোক সেজে থাকতেই হয় । যদিও ছাত্রদের কাছে সবসময় সবরকম যাচাই করে দেখে নেওয়ার কথা বলি, সর্বদা ধরে নেয়া সত্যকে আক্রমণ করতে শেখাই। ত এসবকে আপনি যদি ছদ্মবেশ বলতে চান আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করব না। — আর ভদ্রলোক শব্দটির বিপরীত মেরুতে 'উগ্র' শব্দটি বসানো যায় না বোধ হয়।[১১]

আমাদের আলোচ্য তিনটি গল্পের মধ্যে আঙ্গিকগত বৈষম্য লক্ষিত হলেও বেশ কিছু জায়গায় সাদৃশ্যও রয়েছে। গণ্যমান্য, চরিত্রবান লোক, ভদ্র-সভ্য মানুষ-এর মুখোশের আড়ালে থাকা বিকৃত ভদ্র-সভ্য রূপটিকে প্রকাশ্যে টেনে আনার প্রয়াস লক্ষ করি তিনটি গল্পেই। 'হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি' ও 'বাগানের ঘোড়ানিমের গাছে দেখনচাচা থাকতেন' গল্প দুটিতে ইঁদুরের অনুষঙ্গ এসেছে খাদ্যশস্য খাওয়ার প্রসঙ্গে। এই ইঁদুর মধ্যবিত্ত সত্তার গভীরে নিহিত থাকা কদাকার কুৎসিত রূপের

প্রতিমূর্তি। মধ্যবিত্ত-মূল্যবোধের প্রতিবাদের প্রতিমূর্তিকে শিল্পরূপ দেওয়ার প্রয়াস এই তিনটি গল্পে প্রবল হয়ে উঠেছে।

এই তিনটি গল্পের বিন্যাসভঙ্গি আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। কীভাবে একটি অনুষঙ্গকে বিচিত্রভাবে অনুভূতির তীব্রতায়, সামাজিক কষাঘাতে, ব্যঙ্গের আশ্চর্য রূপায়ণে রূপায়িত করে নিজস্ব ভঙ্গি রচনায় সচেষ্ট হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. বইসংগ্রহ-১ (অ্যান্টি-গল্পসংগ্রহ), সুবিমল মিশ্র, গাঙচিল, প্রথম গাঙচিল সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৮২। (অতঃপর গ্রন্থটি 'বইসংগ্রহ-১' নামে উল্লিখিত)

২. তদেব, পৃ. ১৭।

৩. তদেব, পৃ. ১৮-১৯।

৪. তদেব, পৃ. ১৯-২০।

৫. সুবিমল মিশ্র-র আসলে এটি রামায়ণ চামারের গল্প হয়ে উঠতে পারত ও হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি, শ্রীধর মুখোপাধ্যায়, দ্রষ্টব্য, বর্ষ ৬। সংখ্যা ৭, সম্পাদক- কামরুল হুদা পথিক, ৩৬, সেন্ট্রাল রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫, প্রকাশকাল- অক্টোবর ১৯৯৮, পৃ. ১২১। (অতঃপর পত্রিকাটি ' দ্রষ্টব্য, বর্ষ ৬। সংখ্যা ৭' নামে উল্লিখিত)

৬. বইসংগ্রহ-১, পৃ. ২২।

৭. তদেব।

৮. তদেব, পৃ. ৪৭।

৯. তদেব, পৃ. ৪৯।

১০. গল্পকার সুবিমল মিশ্র, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, দ্রষ্টব্য, বর্ষ ৬। সংখ্যা ৭, পৃ. ১৬৪।

১১. সুবিমল মিশ্র-র সাথে কামরুল হুদা পথিক-এর কথোপকথন, দ্রষ্টব্য, বর্ষ ৬। সংখ্যা ৭, পৃ. ২২৪ ।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা:

১. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা ৬, পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪২২, জুন ২০১৫।

২. দ্রষ্টব্য, বর্ষ ৬। সংখ্যা ৭, সম্পাদক- কামরুল হুদা পথিক, ৩৬, সেন্ট্রাল রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫, প্রকাশকাল- অক্টোবর ১৯৯৮।